ভাষা শহিদদের ইতিহাস

আবুল বরকত (১৯২৭-১৯৫২)
আবুল বরকতের জন্ম ১৯২৭ সালের ১৬ জুন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বারলা গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ২০ নম্বর ব্যারাকের বারান্দায় ছাত্র-জনতার মিছিলে আবুল বরকত শামিল হন। মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। বরকত পেটে গুলিবিদ্ধ হন। মুহূর্তে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁকে আজিমপুর গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

রফিকউদ্দিন আহমদ (১৯২৯-১৯৫২)
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুর সোয়া তিনটা। বাংলাভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে প্রথম শহিদ রফিকউদ্দিন আহমেদ। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের মিছিলে পুলিশের গুলিতে রফিক ঘটনাস্থলে শহিদ হন। তাঁকে আজিমপুর গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

শফিউর রহমান (১৯১৮-১৯৫২)
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। সময় সকাল সাড়ে দশটা। ঢাকার নবাবপুর রোডে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে বিক্ষোভরত ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালায়। মিছিলে শামিল শফিউর রহমান গুলিবিদ্ধ হন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গুরুতর আহত শফিউর ঐ দিন সন্ধ্যা সাতটায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আবদুস সালাম (১৯২৫-১৯৫২)
মহান ভাষা আন্দোলনে শহিদ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনের রাস্তায় ১৪৪ ধারা জারি অবস্থায় ছাত্র-জনতার মিছিল চলে। মিছিলে অংশ নেন আবদুস সালাম। মিছিলে পুলিশের গুলিতে আবদুস সালাম মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি ৭ এপ্রিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান।

আবদুল জব্বার (১৯১৯-১৯৫২)
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সংগ্রামী জনতার বিশাল সমাবেশ চলছিল। পুলিশ সমাবেশে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে সমাবেশে অংশগ্রহণকারী আবদুল জব্বার গুলিবিদ্ধ হন। ঐদিন রাতে চিকিৎসাধীন আবদুল জব্বার মারা যান। তাঁকে আজিমপুর গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

সৈজন্যে: দৈনিক ইত্তেফাক

আমাদের ভাষা শহীদ আসলে কত জন?

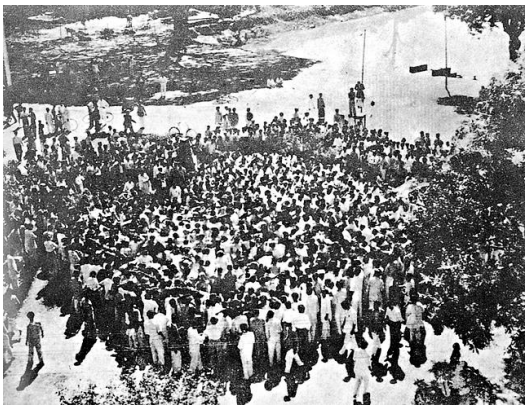

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভেঙে আমতলায় সভা। ছবি: লিবারেশনওয়ার বিডি

ফজলে লোহানী তার একুশের কবিতায় লিখেছেন,

‘শহরে সেদিন মিছিল ছিল।
পৃথিবী সেদিন উল্টো ঘোরেনি; এগিয়ে গেছে।
সবাই শুনলোঃ খুন হয়ে গেছে, খুন হয়ে গেল।
মায়ের দু'চোখের দু'ফোটা পানি গড়িয়ে পড়েছে রমনার পথে।’

সেদিনের মিছিলে সত্যি খুন হয়েছিলেন আমাদের কয়েকজন সোনার ছেলে। ভাষার ইতিহাস আমরা সবাই পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি। ছোটবেলা থেকে বইয়ে পড়ছি, ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ আরও অনেকে।

মনে প্রশ্ন জাগে, সেই সংখ্যাটি আসলে কত? তখনকার পত্রিকা বা সরকারের কারো কাছেই কি এর কোনো হিসেব ছিল না? অনেকে শব্দ দিয়ে অস্পষ্টতা বোঝায়, কারণ মোটামুটি একটা কাছাকাছি সংখ্যা হলেও ধারণা হতো আমাদের। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আমরা পাঁচজন শহিদের নাম বেশি শুনতে পাই: সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিউর। এর বাইরে আর কে কে, কোথায় মারা গেছেন তা জানতে হলে আমাদের তখনকার পত্রিকা বা ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা বইয়ের পাতা উল্টাতে হয়।

মহান ভাষা আন্দোলনের এত বছর পরও শহীদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা হয়নি। প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সরকারি বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে বহু লোক নিহত হলেও তারা সবাই স্বীকৃতিও পাননি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে প্রথম স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের মার্চে। এর প্রকাশক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি মোহাম্মদ সুলতান। সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। সেই বইয়ে কবির উদ্দিন আহমেদ 'একুশের ঘটনাপুঞ্জী' নামে একটি প্রতিবেদনে লিখেছেন, 'শহীদদের লাশগুলো চক্রান্ত করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেডিকেল হোস্টেলের ভেতর 'গায়েবি জানাজা' পড়া হলো।...(পরদিন) সকাল নয়টায় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ মর্নিং নিউজ অফিস জ্বালিয়ে দেয় এবং সংবাদ অফিসের দিকে যেতে থাকে। সংবাদ অফিসের সম্মুখে মিছিলের ওপর মিলিটারি বেপরোয়া গুলি চালায়। অনেকেই হতাহত হয় এখানে।'

১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পত্রিকা 'সৈনিক'-এর প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত'। খবরে বলা হয়েছে, মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র সমাবেশে নির্বিচারে পুলিশের গুলিবর্ষণ বৃহস্পতিবারেই ৭ জন নিহত: ৩ শতাধিক আহত। তাছাড়া দৈনিক আজাদের ওই সময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি গুলিতে ৯ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। বহু লাশ গুম করে ফেলা হয়েছিল।

ভারতের কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল 'বৃহস্পতি ও শুক্রবার মোট ৯ জন নিহত'; আবার অন্য একটি সংবাদে 'পুলিশের গুলিতে গতকল্য ও অদ্য এ যাবত ৬ জন নিহত হয়' উল্লেখ করা হয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় সীমান্ত পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' শিরোনামে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল এ রকম:

'ওরা চল্লিশজন কিংবা আরও বেশি
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে রমনার রোদ্রদগ্ধ
কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়...
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত...'

উল্লেখিত কবিতায় কবি যে ৪০ সংখ্যাটি ব্যবহার করেছেন, তা কি শুধু কবিতার জন্য, নাকি এটি সত্য? আমরা মোটামুটি আটজন শহীদের নাম পেয়েছি।

প্রথম শহীদ মিনার তৈরিতে ব্যস্ত। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের নির্বাসিত লেখক লাল খান তার পাকিস্তানস আদার স্টোরি: দ্য ১৯৬৮-৬৯ রেভল্যুশন বইয়ে লিখেছেন, পুলিশের গুলিতে ২৬ জন নিহত এবং ৪০০ জনের মতো আহত হয়েছিলেন। বইটি ২০০৮ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়।

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অলি আহাদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ২২ ফেব্রুয়ারি ভিক্টোরিয়া পার্কের (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) আশপাশে, নবাবপুর রোড ও বংশাল রোডে গুলিতে কতজন মারা গেছেন, তার সঠিক সংখ্যা কারও জানা নেই। আহমদ রফিক তাঁর 'একুশ থেকে একাত্তর' নামের বইয়ে নিহতদের মধ্যে আবদুল আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ ও সিরাজুদ্দিনের নাম উল্লেখ করেছেন।

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত কবির উদ্দিন আহমদ তার 'একুশের ইতিহাস' নিবন্ধে লিখেছেন, 'আটজনের মৃত্যুর কথা সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়।' এই সূত্র ধরে এম আর আখতার মুকুল আটজন ভাষাশহীদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। তালিকাটিতে ২১ ফেব্রুয়ারি রফিকউদ্দিন আহমদ, আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম এবং ২২ ফেব্রুয়ারি শফিকুর রহমান, আব্দুল আউয়াল, অহিউল্লাহ ও অজ্ঞাত বালককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলা ভাষা আন্দোলন দমনে যশোহরে
পুলিশের অত্যাচার
বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে নিগৃহীত
সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ঃ ব্যাপক বাস্তুত্যাগের সম্ভাবনা

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের খবর কলকাতার যুগান্তর পত্রিকায়। ছবি: সংগৃহীত

তবে ভাষাশহিদ হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছেন পাঁচজন— আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, রফিকউদ্দিন আহমদ, আবদুস সালাম ও শফিউর রহমান। ২০০০ সালে তাদের রাষ্ট্রীয় একুশে পদকে ভূষিত করা হয়েছে। বরকত ও জব্বার ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রফিক ছিলেন বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে। তারা তিনজন নিহত হন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে মারা যান রিকশাচালক সালাম এবং হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রাণ হারানোর তালিকায় আরো দুটি

নাম পাওয়া যায়—অহিউল্লাহ ও আবদুল আউয়াল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে ভাষাশহিদ হিসেবে এই দুজনের নাম-পরিচয় উল্লেখ আছে। এ ছাড়া সালাউদ্দীন নামেও একজন ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন বলে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একুশের শহীদ হিসেবে তাদের স্বীকৃতি মেলেনি। আর এ কারণে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পাঁচজনই ভাষাশহীদ হিসেবে সমাদৃত হচ্ছেন।

এবার দেখব সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তার ডায়েরিতে কী লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ২১ ফেব্রুয়ারি, 'গুলিতে চারজন ঘটনাস্থলেই নিহত হলো। আহত হলো ৩০ জন।' জানা যায়, ৬২ জনকে জেলে ঢোকানো হয়েছে। আরও শোনা যায়, পুলিশ কয়েকটি মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে। বেসরকারি সূত্রের দাবি, মৃতের সংখ্যা ১০ থেকে ১১ জন।' ২২ ফেব্রুয়ারি, তিনি লিখেছেন, 'আজ স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট অব্যাহত থাকল। হাইকোর্ট, মানসী সিনেমা হল ও ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের আশপাশে গুলিবিদ্ধ হয়ে পাঁচজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেল। বেসরকারি সূত্র অনুয়ায়ী মৃতের সংখ্যা ১২, আহত বহু।'

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ভাষা শহীদ আসলে কতো জন এই তথ্য চিরকাল অজানা থেকে যাবে যদি সরকার সংরক্ষিত তথ্যাদি প্রকাশ না করে। বর্তমান প্রজন্ম এই সংখ্যাটি জানতে আগ্রহী। কেননা ভাষা আন্দোলন থেকেই আমাদের জাতীয়তাবোধ জন্মে, আমরা স্বাধীনতার বীজ অন্তরে গাঁথি।

সৈজন্যে: দৈনিক প্রথম আলো

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত গণআন্দোলন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার এ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এতে ঢাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হন এবং ভাষার ব্যাপারে তাঁরা একটি চূড়ান্ত দাবিনামা প্রস্তুত করেন; দাবিটি হলো: পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ও সরকারি কার্যাদি পরিচালনার মাধ্যম হবে বাংলা আর কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি বাংলা ও উর্দু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা (১৯৫২)

ভাষাসংক্রান্ত এই দাবিকে সামনে রেখে সর্বপ্রথম আন্দোলন সংগঠিত করে তমদ্দুন মজলিস। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। ক্রমান্বয়ে অনেক অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন এই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং একসময় তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফোরামে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা চলে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভার আয়োজন করে। সভার পরও মিছিল-প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। এ মাসেরই শেষদিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার আহবায়ক ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। পরের বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রস্তাবে সংশোধনী এনে বাংলাকেও পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখই পূর্ব পাকিস্তানের, যাদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বিরোধিতা করলে এ দাবি বাতিল হয়ে যায়। এ খবর ঢাকায় পৌঁছলে ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা বিক্ষুব্ধ হন। আজাদ-এর মতো পত্রিকাও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আনা প্রস্তাবে যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের সমালোচনা করে। পরে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি নতুন রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয়, যার আহবায়ক ছিলেন শামসুল আলম।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ একটি স্মরণীয় দিন। গণপরিষদের ভাষা-তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া ছাড়াও পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকেটে বাংলা ব্যবহার না করা এবং নৌবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাখার প্রতিবাদস্বরূপ ওইদিন ঢাকা শহরে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটিদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা। ধর্মঘটের পক্ষে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই শ্লোগানসহ মিছিল করার সময় শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল ওয়াহেদ প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। আব্দুল মতিন, আবদুল মালেক উকিল প্রমুখ ছাত্রনেতাও উক্ত মিছিলে অংশ নেন; বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট সভা হয়। একজন পুলিশের নিকট থেকে রাইফেল ছিনিয়ে চেষ্টা করলে পুলিশের আঘাতে মোহাম্মদ তোয়াহা মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ১২-১৫ মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়।

আন্দোলনের মুখে সরকারের মনোভাব কিছুটা নমনীয় হয়। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তবে চুক্তিতে তিনি অনেকগুলি শর্তের সঙ্গে একমত হলেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তাঁকে কোনো কিছুই মানানো যায়নি।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি ঢাকার দুটি সভায় বক্তৃতা দেন এবং দুই জায়গাতেই তিনি বাংলা ভাষার দাবিকে উপেক্ষা করে একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। এ সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। জিন্নাহর বক্তব্য তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়; এর আহবায়ক ছিলেন আবদুল মতিন।

২২ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রাস্তা

১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে থাকে। এ সময় জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান উভয়েই পরলোকগত। লিয়াকত আলী খানের জায়গায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দীন। রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থারও অবনতি ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা হারাতে থাকে। ১৯৪৯ সালে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। পূর্ব পাকিস্তানে বঞ্চনা ও শোষণের অনুভূতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং এখানকার জনগণ ক্রমেই এই মতে বিশ্বাসী হতে শুরু করে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জায়গায় তাদের ওপরে আরোপিত হয়েছে নতুন ধরনের আরেক উপনিবেশবাদ। এ প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা পায়।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেন যে, প্রদেশের সরকারি কাজকর্মে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে তা প্রদেশের জনগণই ঠিক করবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবল উর্দু। সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করেন। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়, যার আহবায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। এ সময় সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব পেশ করে। এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি (একুশে ফেব্রুয়ারি) সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়।

এসব কর্মসূচির আয়োজন চলার সময় সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের (১৯০৫-৭৪) সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা হয়। ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে কিনা এ প্রশ্নে সভায় দ্বিমত দেখা দেয় তবে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সঙ্কল্পে অটুট থাকে।

পরদিন সকাল ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাংশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা হয়। সভা শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকসহ উপাচার্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করেন। তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে আবদুল মতিন এবং গাজীউল হক নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোট ছোট দলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসলে পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে, ছাত্রীরাও এ আক্রমন থেকে রেহাই পায়নি। ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছোড়া শুরু করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামলাতে ব্যর্থ হয়ে গণপরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসররত মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জববার, আবুল বরকত (রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ শ্রেণীর ছাত্র) নিহত হয়। বহু আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের পিয়ন আবদুস সালাম মারা যায়। অহিউল্লাহ্ নামে আট/নয় বছরের এক কিশোরও সেদিন নিহত হয়।

এ সময় গণপরিষদের অধিবেশন বসার প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলি চালানোর খবর পেয়ে গণপরিষদ সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ এবং বিরোধী দলের সদস্যসহ আরও কয়েকজন সভাকক্ষ ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাশে দাঁড়ান। অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বাংলা ভাষার দাবির বিরোধিতা অব্যাহত রেখে বক্তব্য দেন।

পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল গণবিক্ষোভ ও পুলিশি নির্যাতনের দিন। জনতা নিহতদের গায়েবানা জানাজার নামায পড়ে ও শোকমিছিল বের করে। মিছিলের উপর পুলিশ ও মিলিটারি পুনরায় লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট চালায়। এতে শফিউর রহমানসহ কয়েকজন শহীদ হন এবং অনেকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। ছাত্ররা যে স্থানে গুলির আঘাতে নিহত হয় সেখানে ২৩ ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। ১৯৬৩ সালে এই অস্থায়ী নির্মাণের জায়গায় একটি কংক্রীটের স্থাপনা নির্মিত হয়।

গণপরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিল পাস করে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদনের মাধ্যমে এই আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) এক পর্যায়ে এর সদস্য ফরিদপুরের আদেলউদ্দিন আহমদের (১৯১৩-১৯৮১) দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫২ সালের পর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য বাঙালিদের সেই আত্মত্যাগকে স্মরণ করে দিনটি উদ্যাপন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। [বশীর আল হেলাল]

গ্রন্থপঞ্জি আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৭৫; আবদুল হক, ভাষা-আন্দোলনের আদি পর্ব, ঢাকা, ১৯৭৬; বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৭৯।

সূত্র: বাংলাপিডিয়া

ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত গণআন্দোলন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেন যে, প্রদেশের সরকারি কাজকর্মে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে তা প্রদেশের জনগণই ঠিক করবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবল উর্দু। সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করেন। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়, যার আহবায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। এ সময় সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব পেশ করে। এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি (একুশে ফেব্রুয়ারি) সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়।

এসব কর্মসূচির আয়োজন চলার সময় সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের (১৯০৫-৭৪) সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা হয়। ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে কিনা এ প্রশ্নে সভায় দ্বিমত দেখা দেয় তবে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সঙ্কল্পে অটুট থাকে।

পরদিন সকাল ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাংশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা হয়। সভা শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকসহ উপাচার্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করেন। তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে আবদুল মতিন এবং গাজীউল হক নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোট ছোট দলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসলে পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে, ছাত্রীরাও এ আক্রমন থেকে রেহাই পায়নি। ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছোড়া শুরু করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামলাতে ব্যর্থ হয়ে গণপরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসররত মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জববার, আবুল বরকত (রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ শ্রেণীর ছাত্র) নিহত হয়। বহু আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের পিয়ন আবদুস সালাম মারা যায়। অহিউল্লাহ্ নামে আট/নয় বছরের এক কিশোরও সেদিন নিহত হয়।

এ সময় গণপরিষদের অধিবেশন বসার প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলি চালানোর খবর পেয়ে গণপরিষদ সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ এবং বিরোধী দলের সদস্যসহ আরও কয়েকজন সভাকক্ষ ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাশে দাঁড়ান। অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বাংলা ভাষার দাবির বিরোধিতা অব্যাহত রেখে বক্তব্য দেন।

পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল গণবিক্ষোভ ও পুলিশি নির্যাতনের দিন। জনতা নিহতদের গায়েবানা জানাজার নামায পড়ে ও শোকমিছিল বের করে। মিছিলের উপর পুলিশ ও মিলিটারি পুনরায় লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট চালায়। এতে শফিউর রহমানসহ কয়েকজন শহীদ হন এবং অনেকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। ছাত্ররা যে স্থানে গুলির আঘাতে নিহত হয় সেখানে ২৩ ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। ১৯৬৩ সালে এই অস্থায়ী নির্মাণের জায়গায় একটি কংক্রীটের স্থাপনা নির্মিত হয়।

গণপরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিল পাস করে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদনের মাধ্যমে এই আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) এক পর্যায়ে এর সদস্য ফরিদপুরের আদেলউদ্দিন আহমদের (১৯১৩-১৯৮১) দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫২ সালের পর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য বাঙালিদের সেই আত্মত্যাগকে স্মরণ করে দিনটি উদ্যাপন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে।

সূত্র: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট